৩৭

স্থান -- বেলুড় মঠ

কাল -- ১৯০১

স্বামীজীর অসুখ এখনও একটু আছে। কবিরাজী ঔষধে অনেক উপকার হইয়াছে। মাসাধিক শুধু দুধ পান করিয়া থাকায় স্বামীজীর শরীরে আজকাল যেন চন্দ্রকান্তি ফুটিয়া বাহির হইতেছে এবং তাঁহার সুবিশাল নয়নের জ্যোতি অধিকতর বর্ধিত হইয়াছে।

আজ দুই দিন হইল শিষ্য মঠেই আছে। যথাসাধ্য স্বামীজীর সেবা করিতেছে। আজ অমাবস্যা। শিষ্য নির্ভয়ানন্দ-স্বামীর সহিত ভাগাভাগি করিয়া স্বামীজীর রাত্রিসেবার ভার লইবে, স্থির হইয়াছে। এখন সন্ধ্যা হইয়াছে।

স্বামীজীর পদসেবা করিতে করিতে শিষ্য জিজ্ঞাসা করিল, মহাশয়, যে আত্মা সর্বগ, সর্বব্যাপী, অণুপরমাণুতে অনুসূত্য ও জীবের প্রাণের প্রাণ হইয়া তাহার এত নিকটে রহিয়াছেন, তাঁহার অনুভূতি হয় না কেন?

স্বামীজী -- তোর যে চোখ আছে, তা কি তুই জানিস? যখন কেউ চোখের কথা বলে, তখন 'আমার চোখ আছে' বলে কতকটা ধারণা হয়; আবর চোখে বালি পড়ে যখন চোখ কর্‌কর্‌ করে, তখন চোখ যে আছে, তা ঠিক ঠিক ধারণা হয়। সেইরূপ অন্তর হইতে অন্তরতম এই বিরাট আত্মার বিষয় সজজে বোধগম্য হয় না। শাস্ত্র বা গুরুমুখে শুনে খানিকটা ধারণা হয় বটে, কিন্তু যখন সংসারের তীব্র শোকদুঃখের কঠোর কশাঘাতে হৃদয় ব্যথিত হয়, যখন আত্মীয়স্বজনের বিয়োগে জীব আপনাকে অবলম্বনশূন্য জ্ঞান করে, যখন ভাবী-জীবনের দুরতিক্রমণীয় দুর্ভেদ্য অন্ধকারে তার প্রাণ আকুল হয়, তখনি জীব এই আত্মার দর্শনে উন্মুখ হয়। এইজন্য দুঃখ আত্মজ্ঞানের অনুকূল। কিন্তু ধারণা থাকা চাই। দুঃখ পেতে পেতে কুকুর-বেড়ালের মতো যারা মরে, তারা কি আর মানুষ? মানুষ হচ্ছে সেই, যে এই সুখদুঃখের দ্বন্দ্ব-প্রতিঘাতে অস্থির হয়েও বিচারবলে ঐ-সকলকে নশ্বর ধারণা করে আত্মরতিপর হয়। মানুষে ও অন্য জীব-জানোয়ারে এইটুকু প্রভেদ। জে জিনিসটা যত নিকটে, তার তত কম অনুভূতি হয়। আত্মা অন্তর হতে অন্তরতম, তাই অমনস্ক চঞ্চলচিত্ত জীব তাঁর সন্ধান পায় না। কিন্তু সমনস্ক, শান্ত ও জিতেন্দ্রিয় বিচারশীল জীব বহির্জগৎ উপেক্ষা করে অন্তর্জগতে প্রবেশ করতে করতে কালে এই আত্মার মহিমা উপলব্ধি করে গৌরবান্বিত হয়। তখনি সে আত্মজ্ঞান লাভ করে এবং 'আমিই সেই আত্মা', 'তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো' প্রভৃতি বেদের মহাকাব্যসকল প্রত্যক্ষ অনুভব করে। বুঝলি?

শিষ্য -- আজ্ঞা, হাঁ। কিন্তু মহাশয়, এ দুঃখকষ্ট-তাড়নার মধ্য দিয়া আত্মজ্ঞানলাভের ব্যবস্থা কেন? সৃষ্টি না হইলেই তো বেশ ছিল। আমরা সকলেই তো এককালে ব্রহ্মে বর্তমান ছিলাম। ব্রহ্মের এইরূপ সিসৃক্ষাই[১] বা কেন? আর এই দ্বন্দ্ব-ঘাত-প্রতিঘাতে সাক্ষাৎ ব্রহ্মরূপ জীবের এই জন্ম-মরণ-সঙ্কুল পথে গতাগতিই বা কেন?

স্বামীজী -- লোকে মাতাল হলে কত খেয়াল দেখে। কিন্তু নেশা যখন ছুটে যায়, তখন সেগুলো মাথার ভুল বলে বুঝতে পারে। অনাদি অথচ সান্ত এই অজ্ঞান-বিলসিত সৃষ্টি-ফিস্টি যা কিছু দেখছিস, সেটা তোর মাতাল অবস্থার কথা; নেশা ছুটে গেলে তোর ঐ-সব প্রশ্নই থাকবে না।

শিষ্য -- মহাশয়, তবে কি সৃষ্টি-স্থিতি এ-সব কিছুই নাই?

---

[১] সৃজনের ইচ্ছা

স্বামীজী -- থাকবে না কেন রে? যতক্ষণ তুই এই দেহবুদ্ধি ধরে 'আমি, আমি' করছিস, ততক্ষণ সবই আছে। আর যখন তুই বিদেহ আত্মরতি আত্মক্রীড়, তখন তোর পক্ষে এ-সব কিছু থাকবে না; সৃষ্টি জন্ম মৃত্যু প্রভৃতি আছে কি না -- এ প্রশ্নেরও তখন আর অবসর থাকবে না। তখন তোকে বলতে হবে --

ক্ব গতং কেন বা নীতং কুত্র লীনমিদং জগৎ।
অধুনৈব ময়া দৃষ্টং নাস্তি কিং মহদদ্ভুতম্।।[২]

শিষ্য -- জগতের জ্ঞান একেবারে না থাকিলে 'কুত্র লীনমিদং জগৎ' কথাই বা কিরূপে বলা যাইতে পারে?

স্বামীজী -- ভাষায় ঐ ভাবটা প্রকাশ করে বোঝাতে হচ্ছে তাই ঐরূপ বলা হয়েছে। যেখানে ভাব ও ভাষার প্রবেশাধিকার নেই, সেই অবস্থাটা ভাব ও ভাষার প্রকাশ করতে গ্রন্থকার চেষ্টা করছেন, তাই জগৎ কথাটা যে নিঃশেষে মিথ্যা, সেটা ব্যবহারিকরূপেই বলেছেন; পারমার্থিক সত্তা জগতের নেই, সে কেবলমাত্র 'অবাঙ্মনসোগোচরম্' ব্রহ্মের আছে। বল, তোর আর কি বলবার আছে। আজ তোর তর্ক নিরস্ত করে দেবো।

ঠাকুরঘরে আরাত্রিকের ঘন্টআ বাজিয়া উঠিল। মঠের সকলেই ঠাকুরঘরে চলিলেন। শিষ্য স্বামীজীর ঘরেই বসিয়া রহিল দেখিয়া স্বামীজী বলিলেন, ঠাকুরঘরে গেলিনি?

শিষ্য -- আমার এখানে থাকিতেই ভাল লাগিতেছে।

স্বামীজী -- তবে থাক।

কিছুক্ষণ পরে শিষ্য ঘরের বাহিরে নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, আজ অমাবস্যা, আঁধারে চারিদিক যেন ছাইয়া ফেলিয়াছে! -- আজ কালীপূজার দিন।

স্বামীজী শিষ্যের ঐ কথায় কিছু না বলিয়া জানালা দিয়া পূর্বাকাশের পানে একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তাকাইয়া বলিলেন, দেখেছিস, অন্ধকারের কি এক অদ্ভুত গম্ভীর শোভা! কথা-কয়টি বলিয়া সেই গম্ভীর তিমিররাশির মধ্যে দেখিতে দেখিতে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়িয়ে রহিলেন। এখন সকলই নিস্তব্ধ, কেবল দূরে ঠাকুরভরে ভক্তগণপঠিত শ্রীরামকৃষ্ণস্তব-মাত্র শিষ্যের কর্ণগোচর হইতেছে। স্বামীজীর এই অদৃষ্টপূর্ব গাম্ভীর্য ও গাঢ় তিমিরাবগুণ্ঠনে বহিঃপ্রকৃতির নিস্তব্ধ স্থির ভাব দেখিয়া শিষ্যের মন এক প্রকার অপূর্ব ভয়ে আকুল হইয়া উঠিল। কিছুক্ষণ এইরূপে গত হইবার পরে স্বামীজী আস্তে আস্তে গাহিতে লাগিলেন:

নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে ও রূপরাশি।
তাই যোগী ধ্যান ধরে হয়ে গিরিগুহাবাসী।।

গীত সাঙ্গ হইলে স্বামীজী ঘরে প্রবেশ করিয়া উপবিষ্ট হইলেন এবং মধ্যে মধ্যে 'মা, মা, কালী, কালী' বলিতে লাগিলেন। ঘরে তখন আর কেহই নাই। কেবল শিষ্য স্বামীজীর আজ্ঞা পালনের জন্য অবস্থান করিতেছে।

স্বামীজীর সে-সময়ের মুখ দেখিয়া শিষ্যের বোধ হইতে লাগিল, তিনি যেন এখনও কোন এক দূরদেশে

[২] বিবেকচূড়ামণি, ৪৮৪

অবস্থান করিতেছেন। শিষ্য তাঁহার ঐ প্রকার ভাব দেখিয়া পীড়িত হইয়া বলিল, মহাশয়, এইবার কথাবার্তা বলুন।

স্বামীজী তাহার মনের ভাব বুঝিয়াই যেন মৃদু হাসিতে হাসিতে বলিলেন, যাঁর লীলা এত মধুর সেই আত্মার সৌন্দর্য ও গাম্ভীর্য কত দূর বল দিকি?

শিষ্য তখনও তাঁহার সেই দূর দূর ভাব সম্যক অবগত হয় নাই দেখিয়া বলিল, মহাশয়, ও-সব কথায় এখন আর দরকার নাই; কেনই বা আজ আপনাকে অমাবস্যা ও কালীপূজার কথা বলিলাম -- সেই অবধি আপনার যেন কেমন একটা পরিবর্তন হইয়া গেল!

স্বামীজী শিষ্যের ভাবগতিক দেখিয়া গান ধরিলেন:

কখন কি রঙ্গে থাকো মা, শ্যামা সুধা-তরঙ্গিণী,
-- কালী সুধা-তরঙ্গিণী।

গান সমাপ্ত হইলে বলিতে লাগিলেন:

এই কালীই লীলারূপী ব্রহ্ম। ঠাকুরের কথা, 'সাপ চলা, আর সাপের স্থির ভাব' -- শুনিসনি?

শিষ্য -- আজ্ঞে হাঁ।

স্বামীজী -- এবার ভাল হয়ে মাকে রুধির দিয়ে পূজো করব! রঘুনন্দন বলেছেন, 'নবম্যাং পূজয়েৎ দেবীং কৃত্বা রুধির-কর্দমম্' -- এবার তাই করব। মাকে বুকের রক্ত দিয়ে পূজো করতে হয়, তবে যদি তিনি প্রফন্না হন। মা-র ছেলে বীর হবে -- মহাবীর হবে। নিরানন্দে, দুঃখে, প্রলয়ে, মহাপ্রলয়ে মায়ের ছেলে নির্ভীক হয়ে থাকবে।

এইরূপ কথা হইতেছে, এমন সময়ে নিচে প্রসাদ পাইবার ঘন্টা বাজিল। স্বামীজী শুনিয়া বলিলেন, যা, নিচে প্রসাদ পেয়ে শিগগির আসিস।